## ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবীন লেখক শ্রী অমিয়ভূষন মজুমদার। বর্তমানে প্রায় সত্তর বছর বয়সেও তাঁর লেখনী আশ্চর্য রকমের ক্ষুরধার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ষোল বছর পর অমিয়ভূষনের আবির্ভাব। তখন বঙ্গ ভঙ্গের পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধোত্তর অস্থিরতার ছোঁয়া লেগেছিল সমাজজীবনে। অথচ বুদ্ধির দৈন্য, অসংযমী প্রকাশ ও রুচি বিকৃতির অনিবার্য প্রভাব এড়িয়ে এই সার্থক শিল্পী নিও - কল্লোল যুগ থেকে এক সম্পূর্ণ আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে এবং শ্রী সরোজ বন্দোপাধ্যায় তাঁর "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর" গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। দীর্ঘকাল একনিষ্ঠতার ও মৌলিকতার স্বীকৃতি হিসাবে এই বরেণ্য লেখক ইত্রও পুরস্কার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ পুরস্কার, বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার, একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। প্রচার বিমুখ এই সাহিত্য সাধক সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় বিদগ্ধজনের কিছু লেখা বিক্ষিপ্ত ভাবে বেরোলেও তাঁর জীবনী ও লেখা সম্বন্ধে কোনো সামগ্রিক প্রণালীবদ্ধ মূল্যায়ন আজও পর্যন্ত হয়নি। তাই আমরা এই গবেষণাপত্রে সেই আলোচনাই ক্রমানুসারে বিস্তারিত ভাবে করবো।

তাঁর নিজের ও পরিবারের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা জন্মভূমির অস্থিরতায় বহির্গমনে ( একোডাস ) বাধ্য হয়েছিল তারই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ প্রভাব বারবারই তাঁর সাহিত্যে ঘুরে ফিরে এসেছে। ভূমি থেকে বিচ্যুত হলে মানুষের সমস্ত জীবনের অন্বেষাই হয়ে ওঠে এক ফিরে পাবার সাধনা। সাহিত্যিক অমিয়ভূষনের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছে প্রায় নিঃশব্দে। 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই' নাটক দিয়ে যার শুরু হয়েছিল উরুণ্ডী, অ্যাজলনের সরাই ইত্যাদি অজস্র গল্পে যার প্রবাহ অব্যাহত, গড়শ্রীখণ্ড - রাজনগর - নির্বাস - মহিষকুড়ার উপকথা - বিন্দনি - তাসিলার মেয়ের উপন্যাসের মধ্যে সেই চেতনার স্বচ্ছন্দ উপস্থিতি ধরা পড়ে। সেই মূলসুরটি হলো এক উদ্বাস্তু চেতনা। ঘরহারা মানুষ বারেবারে ফিরে পেতে চেয়েছে তাদের নিজস্ব বাসভূমি যেখানে এক নিশ্চিন্ত পরিমণ্ডলে তারা আবার ফিরে পাবে তাদের স্বাধীন ঘর গেরস্থালী, নিজস্ব চিত্তবৃত্তি। মাটির এই দুর্নিবার আকর্ষণে তারা বরণ করে নিয়েছে হাজারো সমূহ দুঃখকষ্ট পথ চলার নিদারুন যন্ত্রনা। মরুভূমির ধূসর বালুকাবেলায়, গহন অরণ্যে, শহরের ইট - কাঠের মধ্যে যে পথচলা তা কখনো সফলতা পেয়েছে আবার কখনো বা পায়নি, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের ভেতরে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবু পথচলা থামেনি। শুধুমাত্র বাসভূমির ক্ষেত্রে নয় এর দোলা এসে লেগেছে মানব ধর্মেও। নিজস্ব বিশ্বাসের সুস্থিত ভূমিটি বিচ্যুত হলে সেওতো একধরনের উদ্বাস্তু জীবন। সেখানে ফেরার জন্য মানুষের তখন সাধনা শুরু হয়। এই প্রয়াস বারে বারে অমিয়ভূষনের সাহিত্যকর্মের ভেতরে চোখে পড়ে।

তাঁর সাহিত্যে যেসব নারীর আমরা সাক্ষাৎ পাই সে সব নারী অনেকটা নদীর মত - পৃথিবীর মাটির মত, নিজস্ব প্রয়াসে তারা গর্ভবতী হন, নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় তার চারপাশকে আলোকিত করে তোলেন। যে কোন তত্ত্বকথা, ন্যায়-অন্যায় বোধের ঊর্দ্ধে সেসব চরিত্রের সুষমা। নদীর মত তার চারদিকের জীবনকে সম্ভাবনাময় করে সেসব নারী চরিত্র অধিকাংশ লেখাতে এসেছে। সর্বোপরি আমরা লক্ষ্য করি যে এসব নারী চরিত্র যেন মূল উৎপাটিত জীবনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক।

উদ্বাস্তু শব্দটি শুধু আক্ষরিক অর্থ বহন করে না। ব্যাপক অর্থে আধুনিক মানুষ মাত্রেই উদ্বাস্তু। আধুনিক মানুষ মর্মন্তুদ ভাবে নিঃসঙ্গ। মহাযুদ্ধ পরবর্তী যুগে নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে জীবনে এসেছে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ। ফলে মানুষের মনে এসেছে এক অনিকেত মনোভাব। এই অর্থেই অমিয়ভূষণের উদ্বাস্তুবোধ প্রতিটি লেখার মধ্যে এক প্রতীকী মাত্রা পেয়ে সার্থকতার তীর্থে উত্তরিত হতে পেরেছে।

বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদারের গদ্য ভাষার একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর গদ্য ভাষা অন্য অনেক সাহিত্যিকের রচনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। বৌদ্ধিক প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত আবেগের চিত্রায়ন তাঁর ভাষার মর্মকথা। দেশী বিদেশী ভঙ্গি আত্মস্থ করে তাকে এক নতুন নির্মাণে পরিনত করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত পদ্মা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত এক বিশাল প্রেক্ষাপট তার সাহিত্যে এসেছে। দেশী বিদেশী সাহিত্যিকদের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ণয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণা পত্রে অমিয়ভূষণের জীবনী, তাঁর সাহিত্য রচনার পূর্বে উল্লেখিত প্রসঙ্গগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর প্রকৃত অবস্থানের আসনটি নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। যিনি আমায় গবেষণার কাজে নানা নির্দেশ ও [illegible] সস্নেহ উপদেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন, সঠিক পথের দিশাটি খুঁজে নিতে সাহায্য করেছেন সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডঃ অশ্রু কুমার সিকদারকে জানাই আমার প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা।

রমাপ্রসাদ নাগ, এম.এ.